দশম অধ্যায়

সমকামিতা ও মানবাধিকার

বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মননই পারে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা দেখেছি অধিকার- বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কিভাবে দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। একটা সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। তাদের ছিলো না কোন ভোটাধিকার। একইভাবে পাশ্চিমে একটা সময় কালো মানুষদের অধিকার ছিলো না সাদা চামড়ার মানুষদের সাথে এক যানবাহনে উঠবার, কিংবা একই ভোজনসভায় যোগদানের। সাদা কালো বিয়ে তো ছিলো চিন্তারও বাইরে। কিন্তু মানুষই পেরেছে এই সমস্ত পুরোনো নিয়মগুলো উপড়ে ফেলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতবর্ষেও একটা সময় দলিত এবং শূদ্রদের একঘরে করে রাখা হতো বর্ণাশ্রমের নামে। তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই গঙ্গাজলে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় তো হেনস্তা আর বঞ্চনা ছিলোই। এখনো যে পরস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে তা নয়, কিন্তু তারপরও আগের মত আর নির্বিচারে অত্যাচার করা অনেকক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয়না। আসলে সারা বিশ্ব জুড়ে সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সমকামীরা আজকের বিশ্বে সংখ্যালঘু, খুব প্রকটভাবেই সংখ্যালঘু। আমাদের মত দেশ গুলোতে তো বটেই, সাড়া বিশ্বেই মোটামুটি তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাদের গায়ে ‘বিকৃত রুচির’ তকমা এঁটে দেয়া তো হচ্ছেই, অনেক দেশেই তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আদালতে। অভিযুক্তদের ওপর ক্রমাগত এবং যত্রতত্র চলছে নির্যাতন। কখনোবা রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেয়া হচ্ছে মৃত্যুদন্ড কিংবা নির্বাসন। সমকামীদের একটা বড় অংশকেই সেজন্য লুকিয়ে থাকতে হয়, তাদেরকে শিখে নিতে হয় বিষমকামী হিসেবে জীবন যাপনের অভিনয়ের, কিংবা সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হতে হয়ে ‘বিবাহিত জীবন যাপনে’। ১৯৫১ সালে ডোনাল্ড ওয়েবস্টার কোরি ‘দা হোমোসেক্সুয়াল ইন আমেরিকা’ নামের ইতিহাস- প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রথমবারের জন্য যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো এমনকি আজকের দিনের সমাজের জন্যও খুবই প্রাসঙ্গিক [1] –

[1] Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub.

> ‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the exclusion from the mainstream of life and culture’

যদিও প্রেক্ষাপট বিচারে ১৯৫১ সালের সাথে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক, তারপরেও সংখ্যালঘুর তকমা সমকামীদের গায়ে কিন্তু রয়েই গেছে – কি পূবে, কি পশ্চিমে। আর রক্ষণশীল সমাজে তো সমকামীদের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয়না একেবারে। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অযুহাতে হত্যা করে হয়েছে[2]। পশ্চিমা 'উন্নত বিশ্বে' মানবাধিকার হয়তো এরকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ে আর নেই, কিন্তু তারপরেও সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা যে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে তা বলা যাবে না। আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি রাজ্যে সমকামীদের কোন কারণ না দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে পাওয়া গিয়েছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কোন সমকামী থাকলে শতকরা প্রায় ১৮ শতাংশ ম্যানেজার তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করবেন, শতকরা প্রায় ২৭ শতাংশ ম্যানেজার চাকুরীতেই তাকে নেবেন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ তাকে কোন রকম প্রমোশন দেবেন না[3]। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিলো যে সমকামীপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্ততঃ পাঁচগুন বেশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, কারণ তারা সবসময়ই নিরাপত্তাজনিত আতঙ্কে ভোগে[4]। ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় এখনো প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ লোক মনে করে সমকামিতা হচ্ছে ‘পাপ’, এবং ৫৯ ভাগ মনে করে এটি নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ, ৪৪ ভাগ মনে করে সমকামী সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা উচিৎ[5]। আর এ সবের বাইরে তো নিগ্রহ, নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার উদাহরণ তো কমবেশি আছেই। ২০০৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় শুধু সেই বছরেই ছয় জন পুরুষ এবং নারীকে সমকামিতার অযুহাতে মেরে ফেলা হয়েছিলো।

তবে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে আমেরিকায় ম্যাথু শেফার্ড নামের ২১ বছর বয়সী এক ছাত্রকে হত্যার ঘটনা। ওয়াইমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র

---

[2] Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,
[3] A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% would refuse to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and O'Hanlan, "Anti-Gay Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay and Bisexual Physicians," San Francisco, 1994.
[4] National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984.
[5] The Advocate, Feb 4, 1997.

১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে বার থেকে ফেরার পথে পরিচয় ঘটে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জেমস ম্যাককিনি এবং রাসেল হ্যান্ডারসনের। ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন তাদের গাড়ীতে করে ম্যাথু শেফার্ডকে ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠায়। গাড়ীতে উঠার পর যখন ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন জানতে পারে যে ম্যাথু শেফার্ড সমকামী, তখন তারা ম্যাথুর উপর চড়াও হয়, পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর তারা অচেতন ম্যাথু শেফার্ডের কাগজপত্র থেকে পাওয়া ঠিকানা দেখে গাড়ী নিয়ে ম্যাথু শেফার্ডের বাড়ী লুট করে। প্রায় আঠারো ঘন্টা পরে ম্যাথুকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়। ম্যাথু তখনো মারা যননি, কিন্তু অচেতন ছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা গেলো তার মস্তিস্কের একটা বড় অংশ (ব্রেন স্টেম) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন, তাপমাত্রা ইত্যাদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তাকে কৃত্রিম জীবন সঞ্চালন যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ম্যাথুর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ম্যাথুকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করলেন। ম্যাথুর এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সারা আমেরিকা জুড়ে। প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমকামী অধিকার সংগঠন গুলোর তরফ থেকে। এই একবিংশ শতকেও কেবল সমকামী হবার কারণেই ম্যাথু শেফার্ডকে যেভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেটি আসলে কল্পণাকেও হার মানায়।

আর আমাদের দেশে তো সমস্যা আরো ভয়াবহ। যদিও নিরপেক্ষ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সারা দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে[6], তারপরেও সেখানে বলতে গেলে সমকামীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করা হয়, এই অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড[7] - যদিও এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ দেশে খুব একটা লক্ষ্যনীয় নয়। এর কারণ, সমকামীরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সাধারণতঃ প্রকাশিত হতে দেয় না। সামাজিক বাধার কারণেই এটি ঘটে। একটা উদাহরণ দেই। আমার খুব কাছের এক পরিচিত বন্ধু ছিলো সমকামী। কিন্তু কখনোই আমি তা জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। এখন থাকছে এক সমকামী পার্টনারের সাথে। তার এই সমকামী প্রবৃত্তির কথা আমি দেশে থাকতে জানতেও পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ অনেকেই এ ধরণের কম বেশী ঘটনার সাথে সম্যক পরিচিত। দেশে অধিকাংশ সমকামীদের আসলে লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অন্য সবার মত বিবাহিত জীবন- যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। যারা এটা পারেন না, তারা

[6] Afsan Chowdhury's report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona : http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm

[7] According to Article 377（Section 377 of the Penal Code） private, adult homosexual sex acts are illegal and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life imprisonment.

অনেকে অবিবাহিতই থেকে যান। আমাদের মুক্তমনা সাইটে বছর কয়েক আগে পিঙ্কু নামে এক ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছিলেন, তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো 'Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh'। তার সেই প্রবন্ধটির উপসংহার ছিলো এরকম[8] –

> আমি বহু সমকামী লোকজনদের জানি যারা বিয়ে করে স্ত্রী- পুত্র- কন্যা নিয়ে সংসার করে চলেছেন। অধিকাংশ সময়েই তারা জীবনভর গোপনীয়তা অবলম্বন করে কাটান। তারা এমনকি তাদের খুব ঘনিষ্ট জন – স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক, সন্তান – সবার থেকেই নিজের প্রবৃত্তি সারাটা জীবন ধরে গোপন করে চলতে বাধ্য হন। আসলে তারা বেড়ে উঠেন একদম একাকী হয়ে। তাদেরকে কেউ জানে না, যদিও চেনে তাদের সবাই। অন্ততঃ এভাবেই আমাদের সমাজ তাদেরকে চিনতে চায়।

হিমেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর রিপোর্টে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়[9] –

> Being gay in Bangladesh isn't easy because society responds differently to sexuality in public and in private … People involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, more than the total population of many countries, prefer the same sex. Even if that estimate is considered to be on the higher side and is reduced by half, the number left would still be significant … One of the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the country's Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence … Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite common in Bangladeshi society. Those practising it are not ostracised, although if caught, are ridiculed …

'নিভৃত সমকামী'দের বেদনাময় জীবন কাহিনী অনেকসময় কেবল ব্যঙ্গ- বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমকামী প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়লে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ

[8] Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; http://www.mukto-mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm

[9] Afsan Chowdhury's report in Himal Magazine, পূর্বোক্ত।

থেকেই নেমে আসে নির্যাতন এবং নিপীড়ন। যেমন, ইন্টারনেটে গে- বাংলা ইয়াহুগ্রপের কো- মডারেটর জন এশলের - এর একটি মর্মন্তুদ ইমেল প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে[10] । ইমেইলটি এরকম -

প্রিয় বন্ধুরা,

আশা করি তোমরা ভাল আছ, কিংবা অন্ততঃ ভাল থাকার অভিনয় করে যেতে পারছ। আমি জন, বাংলাদেশের *ব্যাগ* (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গে' স) - এর কো- মডারেটর। আমি সমকামী এবং এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মোটেই সুখি নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী প্রবৃত্তির ব্যাপারটা জেনে গেছে। তারা প্রথমে এ ব্যাপারটিতে তেমন গা করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। আমি তোমাদের গ্রুপে বেশ অনেকদিন হল লিখতে পারছি না। কারণ আমাকে আমার পরিবার থেকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি আহত হয়েছি। নিরূপায় হয়ে আমি একদিন পুলিশ স্টেশনে গেলাম। কিন্তু পুলিশ কোন কেস ফাইল করতে কিংবা জিডি করতে দেয়নি। আমাকে উলটো বলল - ' তুমি তো দেখছি একটু মেয়েলী ধরণের। ঠিক করে বল - তুমি কি কোতি[11], ড্রাগসেবী নাকি বেশ্যা? আমরা তোমাকে কোন ফাইল- টইল কিংবা জিডি করতে দেব না। এগুলো তোমাদের মামুলী পারিবারিক ব্যাপার। এ সমস্ত ফালতু বিষয়াদি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা। ' তারপর তারা আমার বাবাকে ফোন করে বলল আমাকে বাসায় (মানে নরকে) নিয়ে যেতে। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথেই আমার বাবা, মা বোন এমনকি আমার ছোটভাই পর্যন্ত আমাকে মারতে শুরু করে। আমি হয়তো মরেই যেতাম যদি না আমার পাশের বাসার এক বন্ধু এসে বাঁচাতো। এখন আমার অবস্থা একটু ভালর দিকে। তারা আমাকে এখন বলছে বাসা ছেড়ে চলে যেতে। আমাকে সাত দিন সময় দিয়েছে বাসা ছাড়ার। আমার পার্টনার এ দেশে থাকে না। সুতরাং সে এ ব্যাপারে একেবারেই নিরূপায়। এখন আমাকে তোমরা বল - সমকামী মানে কি সুখি নাকি অসুখি? তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারে, কবে এই গৃহস্থালীর অত্যাচার আর নিপীড়ন বন্ধ হবে? কখন আমরা সোনার বাংলা আর গে- বাংলা পাব, বলতো? বন্ধুরা, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। আমাদের যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি বরং কেবল

[10] Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,
[11] ভারতে এবং বাংলাদেশে পুরুষ রূপান্তরকামীদের চলতি ভাষায় বলা হয় কোতি।

> শুরু, এবং আমরা এখনো আমাদের গন্তব্য কোথায় তা জানি না। বন্ধুরা তোমরা নিজেদের যত্ন নিও, আর ভাল থাকার অভিনয় করে যেও এমনকি তোমার নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হবার শেষ সময়গুলোতেও। এখন যাই। তোমাদের পিঙ্ক স্যালুট,
>
> সলিডারিটি
> জন, কোমডারেটর।

এই একটি মাত্র ইমেইল থেকেই সমকামী হবার যন্ত্রণাটুকু অনুভব করা যায়। এ ধরনের বহু ঘটনা যে আমাদের অগোচরেই থেকে যায়, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলবে।

বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহনন

সামাজিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সমকামীদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা এবং আত্মহনন। ব্যাপারটি সব দেশের জন্যই কমবেশী প্রযোজ্য। আমাদের মত দেশগুলোতে এটি আরো বেশি। সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা এবং সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আমাদের সমাজে কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সমকামীদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। কৈশরের গোড়া থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এ সময় সে লক্ষ্য করে যে, সমবয়সী অন্যান্য বন্ধুদের মত সে নারীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, করে ছেলেদের প্রতি। অপরদিকে একজন রূপান্তরকামী ছেলের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের আচরণ অনুকরণ করার তীব্র স্পৃহা জাগে। ছেলের আচরণ ও পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের ভাব ফুটে ওঠায় মা- বাবা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন, নানা ভাবে তাকে বিরত রাখতে চান। সমগ্র আচরণের মধ্যে মেয়েলীভাব প্রকট হয়ে উঠায় সহপাঠী এবং সহযোগীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে নানারকমের ব্যংগ- বিদ্রুপ এবং লাঞ্ছনা। পরবর্তীকালে এর থেকে তৈরী হয় নানা ধরণের ট্রমা। এই ট্রমাই তৈরী করে নানা ধরণের মানসিক সংকটের বীজ। ধীরে ধীরে তারা অন্তর্মুখী হতে থাকে। তারপর একটা সময় যখন শরীরে এবং মনে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন মানসিক পরিস্থিতি হয় আরো ভয়াবহ। এই সময় তার সমলিঙ্গের মানুষের সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগে। সংখ্যাগরিষ্টরা যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি দেদারসে আসক্ত এবং আকর্ষিত হয়ে চলেছে, সেখানে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, তার নিশ্চয় শরীরে বড় কোন অসুখ আছে,

ফলে তার যৌন চাহিদা আর দশটা মানুষের মত নয়। জন্ম হয়ে সংশয়ের তারপরে হীনমন্যতার। মূলস্রোতের বিষমকামী জীবনে অভ্যস্ত সকলের থেকে অনেক সময়ই কথা চেপে যেতে বাধ্য হয়।

ধরা যাক, কলেজের সামনে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে চায়ের স্টলে বসে আড্ডা মারছে। এমনি সময় স্টলের সামনে দিয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে হেটে গেলো। আর সাথে সাথেই শুরু হল মেয়েটিকে নিয়ে দলের মধ্যে তুমুল আলোচনা। কিন্তু সমকামী ছেলেটি ওই দলের মধ্যে থেকেও আলোচনায় অংশ নিতে অক্ষম । সে অন্য সবার মত পারে না ওই চলে যাওয়া তন্বী তরুনীর দেহ- যৌষ্ঠব নিয়ে বাকী সদস্যদের মতো আমোদিত হতে। হয়তো সে আমোদিত হয় দলেরই অন্য একটি ছেলেকে দেখে। কিন্তু নিজের এই ' অস্বাভাবিক' ভাল লাগার কথাটি সে কখনোই বলে উঠতে পারে না। আর এই না-পারা থেকে তৈরী হয় ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের। সৃষ্টি হয় নানা রকম মানসিক সংকট। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে উঠে। মানসিকভাবে সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আসে বিষন্নতা। নিজের যৌনপরিচয়ের তীব্র সংকট তাকে বিষন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এর উপর মড়ার উপর খারার ঘা হয়ে নেমে আসে পারিবারিক বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবহেলা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতন।

নিজের যৌনপরিচয়ের সংকট এবং তার পাশাপাশি কাছের মানুষ এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি তাকে নিদারুণ বিষন্নতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর এই বিষণ্নতার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আসে আত্মহননের চিন্তা, অন্ততঃ অনেকের মধ্যেই। প্রতিবছর আমেরিকাতে গড়ে পাঁচ হাজার লোক আত্মহত্যা করে, আর এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশই সমান্তরাল যৌনতার মানুষ। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টে[12] এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমান্তরাল যৌনতার মানুষেরা সামাজিক অবহেলার কারণে বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন থাকে তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো উল্লেখ হয় যে, কৈশোর এবং যৌবনেই সমকামীরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে। এর কারণ সহজেই অনুমেয় এবং উপরের আলোচনাতেও এ নিয়ে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ রিপোর্টটি সহজে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এই রিপোর্টটি যাতে প্রাকাশিত না হয়, তার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় চাপে পড়ে তৎকালীন বুশ প্রশাসন এই রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়[13]। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক লেখা

[12] Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989

[13] In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth suicide, with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the Bush/Quayle administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of the entire report; www.leaderu.com/jhs/labarbera.html

প্রকাশিত হতে থাকে। তাই একসময় সরকার রিপোর্ট প্রকাশে বাধ্য হয়। এ ছাড়া গ্রে রেমাফেডির ১৯৯১ সালে লেখা 'Death by Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers' বইয়ে ১৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীর উপর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কৈশোরের কোন না কোন সময় আত্মহননের প্রবণতা প্রদর্শন করে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। সানফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর এইডস প্রিজারভেশন স্টাডিস' এর গবেষকেরা ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরের ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে যাদের বার্ষিক আয় ২০,০০০ ডলারের কম, তাদের শতকরা ৩৩ ভাগের মধ্যে কোন না কোন সময়ে আত্মহননের প্রবণতা জাগে। আর শতকরা ২২ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করে। অন্যদিকে যাদের বাৎসরিক আয় ৮০,০০০ ডলারের বেশী, তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠলেও শতকরা ৯ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করেও বেঁচে যায়।

এ ছাড়া ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকার 'সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল' (সিডিসি) আমেরিকার কয়েকটি বড় শহরে কিশোর কিশোরীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, প্রতি বছর যে সব কম বয়সীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সালের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও সমামিতার সাথে উচ্চহারে আত্মহননের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে[14]।

বিষন্নতা এবং আত্মহনন সমকামীদের জন্য সমস্যা হলেও এগুলো মোটেই বিভীষিকা নয়। সামাজিক পরিবেশের মানোন্নয়ন করে এগুলো থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা সম্ভব। দেখা গেছে, সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির মানুষেরা যে পরিবেশে নিজেদের 'স্বাভাবিক মানুষ' হিসেবে ভাবতে পারে, সে পরিবেশে এমনিতেই আত্মহননের প্রবণতা অনেক কমে আসে। এটি নিঃসন্দেহ যে, সমকামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারুণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে সমকামিতাকে সামজিকভাবে হেয় করা হয়, আর আইনগতভাবে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আত্মহননের প্রবণতাকে প্রতিহত করা দূরূহ ব্যাপার। আমাদের স্কুলে ছোটবেলায় একটা ছেলে পড়তো আমাদের

[14] Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. "The assessment, diagnosis, and treatment of psychiatric disorders in lesbian, gay, and bisexual clients," in Julia D. Buckner, Yezzennya Castro, Jill M Holm-Denoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds. Radcliffe Publishing, 2007, p. 52

সাথে মাসুদ রানা নামে। পরে ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতাম মাসুদ নাকি সমকামী। এর কিছুদিন পরেই মাসুদের আত্মহত্যার খবর পাই। আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি, সেখানেও একটি ছেলে ছিলো, আমার চেয়ে দু চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় 'একটু মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হতো। ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ধরণের বহু ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। ২০০৪ সালে আমি ভারতের একটি পত্রিকায় একটি আত্মহত্যার খবর দেখেছিলাম, পরে আরেকটি বইয়ে এর উল্লেখ পাই [15] -

২৬ শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণার বনঁগা স্টেশনের কিছু দূরে অপর্ণা বিশ্বাস (২০) এবং কাজলী ঘোষ (১৮) নামে দুই তরুণী একসঙ্গে ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণী ছিলেন সমপ্রেমী। এরা একে অপরকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। তাদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে সমপ্রেমের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায় –

মা আমার তুমি ক্ষমা করো।
আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো মা, আমি যে কাজুলীকে খুব ভালবাসি, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। এমনকি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; তাই আমরা দুইজনে মৃত্যুপথ বেছে নিলাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ইতি
অপর্ণা ও কাজলী

আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালবাসার দাবী হিসেবে একটাই অনুরোধ আমাদের দু'জনকে একই শশ্মানে দাহ করবে, এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।

[15] অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

সমকামিতা এবং এইডস

আত্মহত্যা ছাড়াও আরো একটি স্বাস্থ্যগত মিথ্যা প্রচারণার বিষয়ে সমকামীদের প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়। সেটি হল এইডসের সাথে সমকামিতার অনুমিত সম্পর্ক। অনেকেই ভুল ভাবে মনে করেন, সমকামিতার মত বিকৃত যৌনতার কারনেই বোধ হয় এইডস হয়ে থাকে। আমার এই বইয়ের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন দু এক জন পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সমকামিতার মাধ্যমে যেহেতু এইডস ছড়ায়, তো আমি এ ব্যাপারটা কিভাবে দেখি। এর প্রেক্ষিতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তা এখানেও ব্যক্ত করা প্রয়োজনবোধ করছি।

এইডস ছড়ায় এইচ আইভি (এইডস ভাইরাস হিসেবে প্রচলিত) থেকে। বাহক এবং তার যৌনসংগীর দেহে এইডস ভাইরাস না থাকলে বাহক সমকামী হোক আর বিষমকামী হোক, এইডস ছড়াবে না। সমকামিতার কারণে, কারো দেহে 'এইডস'- এর জীবানু গজায় না। কাজেই সমকামিতাকে আলাদাভাবে অহেতুক দোষারোপ করার কোন কারণ নেই। আর সুরক্ষিত যৌন জীবন না থাকলে সমকামী এবং বিষমকামী - যে কেউই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। সেজন্যই আমরা দেখি পতিতাপল্লিতে এইডসের সংক্রমণ বেশী, যদিও সেখানে খুব কম বাহকই সমকামী।

সমকামিতার সাথে এইডসের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এইডসকে সমকামিতার সাথে ট্যাগ করে দেওয়ার একটি ইতিহাস আছে। আশির দশকের প্রথম দিকে যখন এইডসের কথা প্রাথমিক ভাবে মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো, তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি চিকিৎসক এবং গবেষকরাও এই রোগের মূল কারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী লক্ষ্য করে 'বিশেষজ্ঞ'রা ধরে নিয়েছিলেন এটা বোধ হয় 'সমকামিতা সংক্রান্ত' কোন রোগ হবে। রোগটির নামও তারা ঠিক করে রেখেছিলেন – Gay-related immune disorder (GRID)। প্রচলিত নাম ছিলো 'Gay plague'[16]। তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এই অবিশেষজ্ঞীয় এবং অবিবেচনাসুলভ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় সাধারণ মানুষদের মনে সমকামীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়। এমনিতেই তো সমকামীদের উপরে 'বিকৃত যৌনাচরণের' তকমা লাগানোই ছিল, তখন এইডসের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক 'খুঁজে পাওয়ার' ফলে সমকামী সহ সকল সমন্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর নেমে আসতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিশেষ মহল থেকে সমকামীদের একঘরে করে ফেলার প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার অগ্রগতির

[16] Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall Inn Editions, 2000

সাথে সাথে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, এইডস নামক মরণব্যাধিটির পেছনে কারণ হল একটি ভাইরাস - Human immunodeficiency virus বা সংক্ষেপে '*এইচ. আই. ভি*'। এই এইচ আইভি ছড়ায় রক্ত, বীর্য (semen), যোনী প্রবহ (vaginal fluid), এমনকি বুকের স্তন্যপানেও। দেখা গেছে, বাহকের দেহে *এইচ. আই. ভি*'র জীবাণু থাকলে সমকামী যৌনসংসর্গে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যা বিষমকামী যৌনসংসর্গেও ঘটতে পারে।

এটা ঠিক আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইডস রোগের হার বেশী, এখনো[17]। কিন্তু এর পেছনে সমকামিতা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট[18]। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই সমকামীদের চেয়ে বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের হার বেশী। আফ্রিকা মহাদেশটির কথা ভাবা যাক। হত দরিদ্র মহাদেশ - অথচ এইডসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ওখানে সমকামিতার জন্য এইডস ছড়ায়নি। বতসোয়ানার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আক্রান্ত। সাউথ আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ। তাঞ্জানিয়ায় এমন গ্রাম-ও আছে যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই এইডস-এ আক্রান্ত। সেই হতভাগ্য শিশুটির কথা ভাবুন, যে কিনা এইচ আই ভি জীবানু নিয়ে জন্মেছে, স্রেফ তার বাবা মায়ের এইডস সংক্রমণের কারণে। আমি কি সেই শিশুগুলোর ভাগ্যহীনতার জন্য বাবা-মা'র বিষমকামকে দায়ী করব? সেই এইডস আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুগুলোর বাবা মা তো আর সমকামী ছিলো না। তাহলে গ্রাম কে গ্রাম এইডসে উজার হয়ে যাচ্ছে কেন? যুক্তি মানতে গেলে আফ্রিকার এইডসের বিস্তারের পেছনে তাহলে বিষমকামকে দায়ী করা উচিৎ। কারণ, আফ্রিকায় বিষমকামীদের মধ্যেই এইডস সংক্রমণ অনেক বেশি। শুধু আফ্রিকা নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সমকামীদের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। সত্যি বলতে কি - এইডস আসলে সমকামিতা-বিষমকামিতায় কোন বাছ বিচার করে না। আগেই বলা হয়েছে, এইডস সংক্রমণের কারন *এইচ. আই. ভি* ভাইরাস। আপনার বা যৌনসংগীর দেহে এই জীবাণু না থাকলে এইডস আপনার মাধ্যমে ছড়াবে না, তা আপনি সমকামীই হোন, আর বিষমকামীই হোন। সেজন্যই এরিক মার্কোস তার 'ইস ইট এ চয়েস' গ্রন্থে বলেন –

[17] As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, during the year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were among men who were infected through sexual contact with other men

[18] পাশাপাশি সমকামীদের সম্পর্কের বৈধতা এবং আইনী অধিকার অনেক জায়গাতেই না থাকায়, তাদের অনেককেই নির্বিচারী এবং বহুগামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। পরিস্থিতির কারণেই তাদের অনেকেরই যৌনজীবন অধিকাংশ বিষমকামীদের মতো সুরক্ষিত থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে এইডসের হার তুলনামূলকভাবে বেশী থাকতে পারে। এর জন্য সমকামিতা দায়ী নয়, দায়ী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে মানবসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের জটিলতা।

> Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It's an equal opportunity disease that infects people who fail to use the well-understood methods to prevent its spread.

স্টোন ওয়াল রায়ট

সমকামিতার ইতিহাসে স্টোন ওয়াল রায়ট একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রায়টের কথা না জানলে কিংবা না উল্লেখ করলে সমকামিতার ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যাবে। নিউইয়র্ক সিটির গ্রীনউইচ গ্রামের ক্রিস্টপার রোডের ৫১- ৫৩ নাম্বারে "স্টোনওয়াল ইন" নামে একটা রেস্তরা সমকামীদের বার ও আড্ডা দেয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিলো বহুদিন ধরেই। ষাট- সত্তুরের দশকে এ ধরণের 'গে বার' গুলো ছিলো পুলিশি হামলা এবং ধরপাকরের পয়লা নম্বর লক্ষ্যবস্তু। বলা নাই, কওয়া নাই হঠাৎ করেই পুলিশ এ ধরনের বারে এসে সমকামীদের উপর চড়াও হয়ে গণহারে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত আর ফাটকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনে মেতে উঠত। আর সে সময় যাবতীয় আইন- কানুন সবই ছিলো সমকামীদের বিপক্ষে।

চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরা

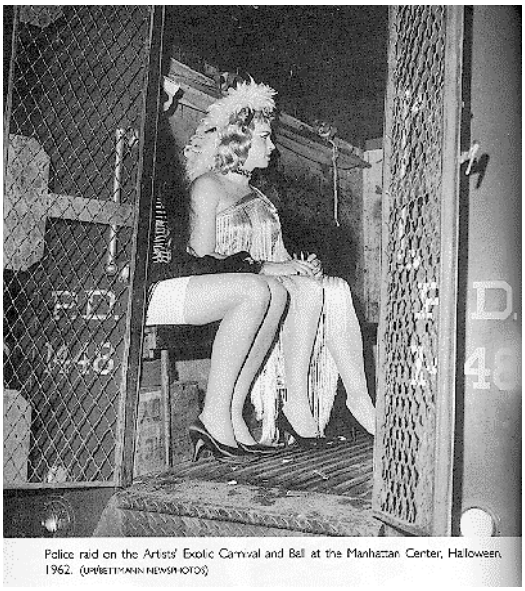

চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরায় গণবিক্ষোভের কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত

দিনটা ছিলো ১৯৬৯ সালের ২৮ শে জুন। পুলিশ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীন উইচের গ্রামের গে- বারটিতে হানা দেয়। সাধারণতঃ ধরপাকরের ব্যাপারটা যেটা ঘটতো – খুবই গতানুগতিক এবং নিয়ম মাফিক। বারে হানা দিয়ে বারের সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যেত। সালের ২৮ শে জুন দিনটা বোধ হয় অন্যরকম ছিলো। পুলিশ বারটিতে হানা দিলে সেখানকার লোকেরা পিছু না হটে সরাসরি পুলিশের সাথে সম্মুখ- লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। থালা বাসন, গ্লাস, বোতল – যার সামনে যা কিছু ছিলো তাই নিয়েই পুলিশের মোকাবেলা করে। একটা পর্যায়ে সব পুলিশদের রেস্তরার ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। সেই পুলিশদের উদ্ধার করতে আরো নিরাপত্তারক্ষীদের পাঠানো হয়। কিন্তু তারা আবদ্ধ সহকর্মীদের দুরাবস্থা দেখা ছাড়া খুব একটা সুবিধা করতে পারেলেননা না। জনগণ ততক্ষণে রেস্তরার আশে পাশের রাস্তাগুলো দখল করে নিয়েছে। পুলিশদের ওভাবেই আবদ্ধ করে রেখে দিনভর আর রাত জুড়ে রায়ট চলতে থাকে। এ ধরণের পরিস্থিতি ছিলো পুলিশের চিন্তারও বাইরে।

এর পরদিন সমকামীদের সমর্থনে গ্রীনউইচ গ্রামের আশে পাশ থেকে আরো বহু লোক এবং সংগঠন এগিয়ে আসে। পুলিশদের উদ্দেশ্য পাথর ছোঁড়া থেকে আগুন জ্বালানো, পোড়ানো – কোন কিছুই বাদ যায় নি। প্রায় চারশ পুলিশএর সাথে যুদ্ধ করছিলো প্রায় দু হাজার সমকামী। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। যে সমকামীদের এতদিন কেবল মেয়েলী, ফ্যাগ প্রভৃতি খোঁটা হজম করে লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত, তারা একজোট হয়ে সূচনা করলেন নতুন এক আন্দোলনের – জন্ম হল সমকামিতা মুক্তির বা 'গে লিবারেশন' (Gay Liberation) - এর। বস্তুতঃ স্টোনওয়াল ইন এর এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিলো ভবিষ্যতের আন্দোলনের শক্তি এবং সাহস। কবি এলেন গিন্সবার্গ পরে 'ভিলেজ ভয়েস' ইস্যুতে লিখেছিলেন –

> You know, the guys there were so beautiful. They've lost that wounded look that fags all had ten years ago.

স্টোনওয়াল ইন- এর প্রভাব পরবর্তী কালের আমেরিকান রাজনীতিতে ব্যাপক। নিউইইয়র্কের মেয়র জন লিন্ডসের প্রেসিডেন্টশিয়াল ক্যম্পেইনের সামনে সমকামীরা দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের আন্দোলনের মুখে মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন – সমকামী বারে হানা দিয়ে লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং হেনস্তা না করতে। সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির কারণে সমকামীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেলেন তারা।

সমকামী অধিকার কর্মীরা এ সময় নজর দিলেন মনোবিজ্ঞানীদের দিকে, যারা বহুদিন ধরেই সমকামিতাকে এক ধরণের 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিলেন। এ সময় ডঃ এভেলিন হুকার এবং কিন্সের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকে। তাদের এই গবেষণা থেকে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন যে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। মানবজীবনের যোউনতার এই ক্যানভাসে বিষমকামীতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সমকামিতাও। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মতো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটাও কার কারো মধ্যে খুবই স্বাভাবিক। সমকামী হয়েও বহু লোকই সুখী জীবন যাপন করেছে – এ ধরণের বহু উদাহরণ সমকামী অধিকার কর্মীরা সামনে নিয়ে আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন মানসিক ব্যধি নয়, বরং এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারা রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেন। এটি যে সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয় তা এ বইয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (সপ্তম অধ্যায় দ্রঃ)।

মানবাধিকার সংগঠন এবং সাপোর্ট গ্রুপ

স্টোনওয়াল রায়টের প্রভাব শুধু আমেরিকাতেই পড়েনি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকার মতই ইউরোপ এবং এশিয়ার সমকামী প্রবৃত্তির লোকেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সারা দুনিয়া জুড়েই আনাচে কানাচে জায়গায় তৈরি হতে থাকে সমকামীদের নানা ধরণের সংগঠণ। সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের মানবাধিকার রক্ষায় আজ এগিয়ে এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো খ্যাতনামা সংগঠন। বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের সেবায় ও পুনর্বাসনে অ্যামনেস্টি তার কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে পুরোমাত্রায়। মানবাধিকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে অ্যামনেস্টিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যখন সমকামিতা তথা সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর বহু নিয়ম নিষেধ শাস্তির বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হতে হচ্ছে সেখানে পুরো ব্যাপারটাকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখবার পক্ষপাতী অ্যামনেস্টি। তারা সমকামিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংগঠিত নির্যাতন এবং নিপীড়নের কড়া প্রতিবাদ জানায়। সমকামিতা নৈতিক নাকি অনৈতিক - সেটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল - সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি থাকার কারণে কেন কিছু মানুষ নিগ্রহ এবং নিপীড়নের স্বীকার হবে। ১৯৯১ সালের সভায় তাদের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের

মিটিং- এ তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমকামিতার কারণে যাদের কারাবরণ করতে হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবীতে অ্যামনেস্টি সোচ্চার হবে। তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, স্টোনওয়াল ইন- এ যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে, তার বলিষ্ঠ কোন প্রতিবাদ তখন জানানো সম্ভব হয়নি। তার প্রতিদান দেবার সময় হয়েছে আজ, আর সেই লক্ষ্যেই অ্যামনেস্টি কাজ করে যাবে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কার্যনিবাহী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানেও সমকামিতার জন্য যারা সারা পৃথিবী জুড়ে নিগৃহীত হচ্ছে, তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেয়া হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে, ওই সময় ব্রাজিলে দুজন আইনজীবী এক রূপান্তরকামী মানুষের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এ কারণে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। অপর একটি ঘটনায় জিম্বাবুয়ের একজন স্ত্রী সমকামী এক্টিভিস্ট একই ধরণের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি সাংগঠনিকভাবে এই ঘটনাগুলোর সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব ধীরে ধীরে মার্কিন মুল্লুকেও পড়তে শুরু করে। আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরা অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হলে সে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত আইন মার্কিন সিনেটে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এর ধরণের বিষয়ে আশ্রইয়গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, কখনো বা হতে হয় সরকারী কর্মচারী কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা হেনস্তা। এ ছাড়া এ ধরণের মামলায় জড়িত আইনজীবীদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অভাব। এ ব্যাপারে সামনে এগিয়ে এসেছেন দুই প্রখ্যাত আইনজীবী রজার ডটি (Roger Doughty) এবং স্যারো ডালবেরী (Sarrow Dulberry)। যে সব আইনজীবীরা সমকামীদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করতে চান, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে বলে ডটি এবং ডালবেরী মনে করেন। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে শতাধিক আইনজীবীকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরা অসংখ্য গে এবং লেসবিয়নদের আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু আমেরিকায় নয় - ভারতেও আছে 'ইন্ডিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ল' (India Center for Human Rights and Law) নামের একটি সংগঠন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তৈরী হয়েছে বিভিন্ন আইনী সংগঠন। তারা সমকামীদের আইনী অধিকারের লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।

একটা সময় পশ্চিমে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হতো। অস্কার ওয়াল্ড- এর মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক কিংবা এবং অ্যালেন টুরিনের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সমকামিতার জন্য দন্ড পোহাতে হয় একটা সময়। ১৮৯৫ সালে সমকামিতার দায়ে অস্কার ওয়াল্ডের বিচার ও দন্ডপ্রদান পাশ্চাত্য সমকামিতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ

মাইলফলক। লর্ড আলফ্রেডের সাথে ওয়াইল্ডের সমকামী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ডগলাসের বাবা মার্কুয়েস অব কুইন্সবেরী ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে পায়ুকাম বা 'সডোমি'র অভিযোগ আনেন। তিন তিনবার মামলা আদালতে ওঠে। ওয়াইল্ড আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন -

> "The Love that dare not speak its name" in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the "Love that dare not speak its name," and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it."

এহেন বগ্মীতা সত্ত্বেও ওয়াইল্ড সেসময় দন্ড এড়াতে পারেননি। ওয়াইল্ডের অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দু' বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

অ্যালেন টুরিন (Alan Turing) ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের 'টুরিন টেস্টের' জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাকে সমকামীতার জন্য দোষী প্রমাণ করে সায়ানাইড খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র চল্লিশ। তার অসামান্য প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় এভাবেই! এবং তা করা হয় রাষ্ট্রীয় ভাবেই। বোঝাই যায়, কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমকামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের একটা সময় যেতে হয়েছে। যে দন্ডধারায় সে সময় ওয়াইল্ড বা টুরিনকে দন্ড পোহাতে হয়েছিলো তা পরিচিত ছিলো 'ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' নামে। এই আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিলো। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে বলবৎ ছিল।

সে হিসেবে আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে। টুরিনের উপর সে সময়কার অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এতোদিন পর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে[19]। আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে সমস্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সেগুলো হল –

১। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার,
২। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশের অধিকার,
৩। সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মনোবৃত্তির জন্য নিগৃহীত না হবার অধিকার,
৪। সাংস্কৃতিক লিঙ্গানুযায়ী সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকার,
৫। নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার অধিকার,
৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার,
৭। মানসিক রোগী হিসেবে পরিচিত না হবার অধিকার,
৮। যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন প্রকৃতিকে প্রকাশ করার অধিকার,
৯। বিবাহের অধিকার,
১০। দত্তক গ্রহণ এবং পিতা- মাতা হিসেবে শিশু পালনের অধিকার ইত্যাদি।

শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদের উপমহাদেশেও সমকামী সহ সমান্তরাল যৌনতার মানুষগুলোর অধিকার সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন আয়োজন এবং জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নানা দিকে। গড়ে উঠছে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপরেখা। রয়েছে উভলিঙ্গ মানবদেরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মুম্বই থেকে ভারত সমপ্রেমীদের প্রথম পত্রিকা 'বোম্বে দোস্ত' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক রাও কবি। তিনি ১৯৮৫ সালেই *স্যাভি* (Savvy) পত্রিকায় নিজেকে সমকামী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন - যা জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অশোক রাও কবির এই সাক্ষাৎকার সমকামীদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নেয়। এদিকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে তৈরী হয় নাজ ফাউন্ডেশনের (Naz Foundation International)। এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে সমকামীদের স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য নানা প্রকল্প চালু হয়। ঐ একই বছর দিল্লীর 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' (ABVA) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতের সমপ্রেমীদের জীবন ও সমস্যার ওপর 'Less than Gay' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি সমকামীদের সমানাধিকারের পাশাপাশি সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের জন্য আন্দোলনের

[19] PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's mistreatment by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm

মজবুদ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৯১ সালেই বোম্বে দোস্ত পত্রিকার অনুসরণে কলকাতায় প্রকাশিত হয় 'প্রবর্তক' এবং ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় 'আরম্ভ'। এর পর কলকাতা থেকে রূপান্তরকামীদের (কোতিদের) জন্য প্রকাশিত হয় 'প্রত্যয়'। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমপ্রেমীদের অসংখ্য পত্রিকা। প্রবাশ থেকে প্রকাশিত 'ত্রিকোন' নামে একটি পত্রিকা উপমহাদেশের সমকামী মানুষের আর্তি, বেদনা এবং সমস্যা তুলে ধরে, এবং সেই সাথে সংখ্যালঘু সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের প্রতি সামাজিক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রিন্টেড মিডিয়ায় সমকামীদের অধিকার নিয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেটে বাংলায় ভাল রিসোর্স তেমনি ভাবে ছিলো না। একবিংশ শতকে সচলায়তন এবং মুক্তমনা সহ বাংলা ইউনিকোড ভিত্তিক ব্লগ সাইটগুলো জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে ইউনিকোডে বাংলায় এ ধরণের লেখা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় ২০০৬ সালে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে আমার 'সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?' নামের সিরিজটি। এই সিরিজটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ তৈরি হয়। প্রানীজগতের মধ্যে সমকামিতা, উভকামিতা এবং রূপান্তরকামীতার অজস্র উদাহরণ প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার আকর্ষনীয় ফলাফলগুলো প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় বাঙ্গালী পাঠকদের সামনে। বহু পাঠক সিরিজটি পড়তে পড়তেই মত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধটি সমকামিতা সম্বন্ধে তাদের সনাতন মনোভাব বদলে দিচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লগ সাইটগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু সচেতন লেখকদের অংশগ্রহণ স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি করে আলোচনা এবং বিতর্কের নতুন পরিবেশ। যে বিষয়টিকে এতদিন অজ্ঞতার অপশাসনে দীর্ণ করে রাখা হয়েছিলো, ব্লগস্ফিয়ারের বিভিন্ন লেখকদের সাহসী লেখালেখিগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ উন্মোচন ঘটালো।

এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে উপমহাদেশের মানবাধিকার আন্দলন এক নতুন দিকে বাঁক নেয়। এ বছরের জুন মাসে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৭ নং ধারা - যা সমকামকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন আচরণ' হিসেবে অভিহিত করেছে - 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' (ABVA) নামের সংগঠনটি এই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে। ABVA এর পক্ষে রাজেশ তালওয়ার এবং শোভা আগারওয়াল সাওয়াল করেন। এই মামলার তখন নিষ্পত্তি না হলেও এর প্রভাব পড়ে সারা দেশ জুড়ে। ১৯৯৪ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বরে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সমপ্রেমীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ সালুঙ্কি। তিনি বলেন -

> Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our character. We do not wish to accept that we are like any other culture on

> earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream heterosexual societies.

সালুঙ্কির এই সাহসী বক্তব্য সমকামিতার আইনী স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনকে ঋদ্ধ করেছিলো। যা হোক বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে এক যুগান্তকারী রায় দেয়, এবং এর ফলে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো - এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটে। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সমকামিতার আইনী অধিকার খুব একটা আশাপ্রদ নয়। দেশের সংবিধানের পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনে সমকামিতাকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে -

> "Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may be extend to ten years, and shall also be liable to fine".

এই পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনের অংশটি সংবিধানের মূলনীতি - '*সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার*' (Part II Article 19) এবং '*সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন*' (Part III Article 27) এর পরিস্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্বমানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। সারা পৃথিবী আজ পুরো বিষয়টিকে যে ভাবে দেখছে, তার ছিটেফোঁটাও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধরেরা অনুধাবণ করেনি। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আইন সংশোধন করার কোন আগ্রহ আপাততঃ তাদের নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিলো। তারপরেও পচাত্তর পর্যন্ত কাগজে কলমে যাও বা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল - ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সংযুক্ত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। উচ্ছেদ ঘটে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ- এর; ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে। তার পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা কেবল খারাপই হয়েছে বলা যায়। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্ম এবং মৌলবাদকে মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর

পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি। সে সময় দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবলোকন করেছে সবাই। একই ধারায় 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সমিতি' এবং 'ইসলামী ঐক্যজোট'- এর মতো চরম রক্ষণশীল কিছু গোষ্ঠি দেশে শারিয়া আইন বাস্তবায়নের পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর মত দলগুলোও শারিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থক। এদের পেছনে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আরবদেশের প্রচ্ছন্ন মদদ এবং অর্থশক্তি। শারিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সৌদি আরব, ইরান, বাহারাইন, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই, ওই সমস্ত দেশের মতো শারিয়া আইন দেশে কখনো বাস্তবায়িত হলে সৌদী আরব এবং ইরানের মত প্রকাশ্য রাস্তায় সমকামীদের হত্যা করার কুৎসিৎ রীতি দেখতে হবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদশে সমকামী আন্দোলনের কর্মীরা নানা ঘাত- প্রতিঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি। তারপরেও আশার কথা এই যে, বয়েস অব বাংলাদেশ (বব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গেস (ব্যাগ) নামে দুটি গ্রুপ বাংলাদেশে সমকামিতার উপর মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সখিনী এবং সপ্রভা নামের দুটি সংগঠন কাজ করছে নারী সমকামিতার উপর। বাঁধন হিজড়া সংগঠন কাজ করছে উভলিংগ মানবদের পশ্চিম বঙ্গে স্যাফো, প্রত্যয়, প্লাস, পাম, কোমল গান্ধার, প্রান্তিক বনগাঁ সহ বহু সংগঠন সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com, প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার নিপীড়ন, ব্যথা বেদনা নিয়ে লিখছে। তবে আমরা মনে করি সমপ্রেমীদের মানবাধিকার অর্জনের লড়াই, শুধু তাদের একারই নয়, এ লড়াইয়ে বিষমকামীদেরও সামিল হওয়া প্রয়োজন। আসলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। সে জন্যই মুক্তমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত, গড়ে দিতে চাইছে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আমরা আশা করব এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমপ্রেমীদের মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র অনেকদূর প্রসারিত হবে। হাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় বাইতে থাকা সংখ্যালঘু যৌন- প্রবৃত্তির মানুষেরা তখন লর্ড বাইরনের মত উচ্চারণ করবে -

Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,
streams like the thunderstorm against the wind.

সমাপ্ত